তারিখ ..05 JUN 2015...
পৃষ্ঠা ...[illegible]... কলাম ...[illegible]...

প্রথম আলো

শিক্ষকের অসম্মান বেতনে এবং ছাত্রলীগের হাতে

উ চ্চ শি ক্ষা

কাবেরী গায়েন

বাংলাদেশে সবচেয়ে সহজে মারা যায় শিক্ষকদের। যাকে বলে, ভাতে মারা এবং হাতে মারা। সবাই মারে তাঁদের, শিক্ষকেরা পাল্টা মার দিতে পারেন না বলেই হয়তো। আন্দোলনরত প্রাথমিক শিক্ষককে যদি মারা যায় মরিচ গুঁড়ার স্প্রে চালিয়ে, তো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে মারা যায় দলীয় ক্যাডার লেলিয়ে। অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের 'শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের মেরেছে' বলে বিস্মিত হয়েছেন। আমি হইনি। তাঁর বৃষ্টিতে ভিজতে থাকা ছবি, তাঁর গলায় দড়ি দেওয়ার মতো মানসিক পরিস্থিতিতে পৌঁছানোর বিষণ্ন কথনে আমি শিক্ষকদের ওপর ধারাবাহিক অসম্মানের কফিনে শেষ পেরেক ঠোকার দৃশ্যটি দেখতে পাই। সেই সঙ্গে আমাদের দায়টিও কমবেশি দেখতে পাই। সম্মানহানি তো অনেক আগেই শুরু হয়েছে, প্রস্তাবিত বেতনকাঠামোতেই তাচ্ছিল্যের চূড়ান্ত প্রকাশ ভেবেছিলাম। কিন্তু না, সরাসরি শারীরিকভাবেও লাঞ্ছিত হলেন শিক্ষকেরা।

অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা শিক্ষার্থীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হন, এখন পর্যন্ত। এখানে টাকা নেই, বসার জায়গা নেই, গবেষণায় বরাদ্দ নেই, আবাসিক ব্যবস্থা পেতে বহু বছরের সাধনা করতে হয়—তবু সেরা শিক্ষার্থীটি যে আজও শিক্ষক হতে চান, এ এক জাতিগত অভ্যাস। এ উপমহাদেশে শিক্ষকতা মহান পেশা হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে প্রাচীনকাল থেকে। গুরুর ঘরে চাল থাকবে না, সবচেয়ে দামি কাপড়টি তাঁর সন্তান পরতে পারবে না, কিন্তু তাঁর সম্মান থাকবে। সেই সম্মান আজ আর নেই, কিন্তু পাখি উড়ে গেলেও 'পড়ে থাকে স্মৃতির পালক'-এর মতোই সম্মান নামের স্মৃতির ঘোর। সবচেয়ে সেরা শিক্ষার্থী সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করেন, পিএইচডি-পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা শেষ করে, বছর বিশেক চাকরি করার পরেও যে বেতন পান, তা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর সদ্য পাস করা শিক্ষার্থীর কোনো বহুজাতিক কোম্পানিতে সদ্য যোগ দেওয়া চাকরির বেতনের চেয়ে কম।

আমার মনে আছে, শিক্ষাজীবন শেষ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেওয়ার পরে আমার মাতামহী আমার বেতন জিজ্ঞেস করেছিলেন। বেতনের অঙ্ক শুনে মুখ শুকনো করে বলেছিলেন, 'একটা ভালো চাকরি নিতে পারলে না? তিনি তাঁর পরিচিত গণিত বিষয়ের এক স্কুলশিক্ষকের নাম উল্লেখ করেছিলেন, প্রাইভেট পড়িয়ে যিনি মাসে ৪০ হাজার টাকা আয় করতেন তখনই। 'তোমার মাস্টারিতে প্রাইভেট নাই?' খুব হেসেছিলাম তখন। বয়স কম, আদর্শতাড়িত মন, তখনো আওড়াই সক্রেটিস, 'হাউ মেনি থিংস আই ক্যান ডু উইদাউট।' ভাবতাম, একজন বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকের সম্মানই আসল কথা, বেতন-প্রাইভেট দিয়ে মাপা যায় না। হা সম্মান!

শুনেছি, পাকিস্তান আমলে সরকারি কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদের বেতনকাঠামো সমপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের চেয়ে একটু বেশি ছিল। স্বাধীন দেশে সমান হয়েছে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ক্রমেই কমেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক বা সহকারী অধ্যাপক যে বেতন পান, সেই বেতনে আসলে ঢাকা শহরে একটি বাসযোগ্য বাসা ভাড়া করে পরিবার নিয়ে থাকা সম্ভব নয়, যদি না বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা দেখেন তিনি। অথচ সেই ১৯০৭ সালে 'হারভেস্ট জাজমেন্ট'-এ অস্ট্রেলিয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল আরবিট্রেশন কোর্টে বিচারপতি হিগিনস একজন শ্রমিকের ন্যূনতম বৈধ মজুরি ঘোষণা করেছিলেন এই মর্মে যে একজন অদক্ষ শ্রমিকের নিজেকে চালানো, তাঁর স্ত্রী ও তিন শিশুসন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানসহ গ্রহণযোগ্য স্বাচ্ছন্দ্যে চালানোর সমপরিমাণ অর্থ হবে ন্যূনতম মজুরি। বলাই বাহুল্য, সেই ন্যূনতম মজুরি আমাদের নেই। এই অবস্থা অবশ্য একজন শুরুর দিকের সরকারি কর্মকর্তারও, তবে পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ে, শিক্ষকদের সে সুযোগ নেই। অন্যান্য চাকরির বেতন বা সুযোগ-সুবিধার দিকে তাকাইনি কখনোই, জানি যে আমি স্বেচ্ছায় এসেছি এই চাকরিতে। এও জানি যে বহুদিন থেকেই শিক্ষকেরা স্বতন্ত্র বেতনকাঠামো দাবি করে আসছিলেন। স্বতন্ত্র কাঠামোর সুপারিশই করেছে বটে ফরাসউদ্দিন কমিশন!

সপ্তম বেতনকাঠামো পর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদের বেতনকাঠামোতে বৈষম্য ছিল না। 'সিলেকশন গ্রেড' পাওয়া অধ্যাপকেরা সরকারের সর্বোচ্চ বেতনকাঠামোর অধিকারী হয়ে সচিব পদমর্যাদায় বেতন-ভাতা পেতেন। দুই বছর আগে 'সিনিয়র সচিব' পদ চালু করা হলে শিক্ষকেরা এক ধাপ পিছিয়ে পড়েন। প্রস্তাবিত জাতীয় বেতনকাঠামো নিয়ে সচিব কমিটির সুপারিশে সচিবের ওপরে 'মুখ্য সচিব/মন্ত্রিপরিষদ সচিব' ও 'সিনিয়র সচিব' নামে পৃথক দুটি স্কেলের সুপারিশের মাধ্যমে শিক্ষকেরা দুই ধাপ পিছিয়ে পড়েছেন। সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপকেরা জাতীয় বেতন স্কেলে দুই ধাপ পিছিয়ে পড়লে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষকেরাও পিছিয়ে পড়বেন। যদিও সিলেকশন গ্রেডকেই বাতিল করার সুপারিশ করা হয়েছে।

এ ছাড়া মূল বেতনকাঠামোতে সপ্তম বেতনকাঠামোর এক ধাপ নিচে বেতন বিন্যাসের প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে তিন ধাপ অবনমন সত্যিই বিস্ময়কর। প্রজাতন্ত্রের বেতনকাঠামো যেহেতু পদমর্যাদার স্মারক, তাই বেতনকাঠামোর এই অবনমনমূলক প্রস্তাব শিক্ষকদের মর্যাদার ওপর সরাসরি আঘাত। সচিব কমিটির এই সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে বেতন ও পদমর্যাদা কমে যাবে দেশের ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষকের। কী এমন ঘটল যে এহেন সুপারিশ করা হলো!

এমন একটি অসম্মানজনক প্রস্তাবের বিপরীতে সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু গণমাধ্যমে এই ভদ্রোচিত আন্দোলনের তেমন অভিঘাত নেই। কোনো রাজনৈতিক দলের বক্তব্য শুনিনি এ বিষয়ে। টক শোতে ঝড় ওঠেনি শিক্ষকদের ওপর এহেন অসম্মানজনক প্রস্তাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এতটা গুরুত্বহীন কবে হলেন?

এরই সঙ্গে যুক্ত হলো শিক্ষকদের ওপর ছাত্র নামধারীদের মার, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। যে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করা হয়েছে, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষা চালিয়ে আন্দোলন করছিলেন। তবু একদল 'শিক্ষার্থী' লাঞ্ছিত করল শিক্ষকদের। কার মদদে? উপাচার্য মহোদয় ইতিমধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন, তবে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করার ঘটনা তদন্তের জন্য নয়, তাঁর ওপর কেন 'হামলা' হয়েছে, সেটি দেখার জন্য।

প্রজাতন্ত্রের বেতনকাঠামো পদমর্যাদার স্মারক, অথচ শিক্ষকদের জন্য তা মর্যাদাহানিকর

স্বাধীনতার পরে, বিশেষ করে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পরে, সেনাশাসনের সময় থেকে শিক্ষক-ছাত্র রাজনীতির নামে যে প্রবল দলীয়করণ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, সেই প্রতিকারহীন ঘটনাপ্রবাহের ফলাফল ফ্রাঙ্কেনস্টাইন দানব হিসেবে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ক্রমান্বয়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বানানোর চেষ্টা হয়েছে সব সরকারের আমলে। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আমূল পরিবর্তন থেকেই বোঝা যায়, শিক্ষক-রাজনীতি আসলে কতটা নতজানু রাজনৈতিক ক্ষমতার কাছে। রাতের অন্ধকারে ভিসি অফিস দখলের মতো নির্লজ্জ ঘটনাও ঘটেছে। শিক্ষকদের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পরিবর্তে যখন থেকে শিক্ষকেরা সরকারের অনুকম্পায় পদাসীন হতে শুরু করেছেন, তখন থেকেই সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার প্রয়োজন তীব্র হয়েছে। যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে, সেই সরকারের পছন্দের ব্যক্তিকে, যখন স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে থোড়াই জ্ঞান করে হাতে ধরে ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়া হয়, তখন তাঁকে রক্ষা করার দায়ও সরকারেরই বৈকি। কখনো পুলিশ দিয়ে, কখনো দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে এই পাহারা দেওয়া হয়। আমরা এই প্রক্রিয়াটিকে প্রশ্নবিদ্ধ না করে কেবল শিক্ষকদের গায়ে হাত তোলাকে নিন্দা জানাতে পারব ঠিকই, কিন্তু পরবর্তী আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারব না। দুঃখের বিষয়, এত বড় ঘৃণ্য একটি ঘটনা ঘটল, কিন্তু সারা দেশের শিক্ষক সমাজ তবু একত্র হয়ে প্রতিবাদ জানাতে পারল না।

শিক্ষক-রাজনীতি কিংবা ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তো 'মাত্র' অল্প কয়েকজন শিক্ষক, তাঁদের হাত-পা বাঁধা জানি। বিশ্বাস করি, বেশির ভাগ শিক্ষকই বেদনাবোধ করেন রাষ্ট্রের আর সরকারি ছত্রচ্ছায়ায় সংঘটিত এমন সব অসম্মানের। এখনো যদি আমরা এসব অপমানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না পারি, কবে আর পারব তবে?

শিক্ষকেরা দলীয় রাজনীতি আর আনুগত্যের বাইরে তাঁদের প্রবল শিক্ষক সত্তা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারেন যদি, আমার বিশ্বাস, এখনো সময় আছে। প্রস্তাবিত বেতনকাঠামোর অসম্মান কিংবা সরকারি ছাত্রসংগঠনের ক্যাডার দিয়ে শিক্ষক পেটানোর মতো ঘটনাও যদি আমাদের একত্র প্রতিরোধে দাঁড় না করাতে পারে, তবে পরবর্তী মার এবং আরও অসম্মান মেনে নেওয়ার জন্য তৈরি থাকাই ভালো। অসম্মান তো তাঁদেরই করা যায়, যাঁদের সম্মানবোধকে আনুগত্যে রূপান্তর করা সম্ভব হয়েছে, আর যাঁদের পেশাগত ঐক্যে এমন বিভাজন ঘটেছে যে পেটানোর পরেও তাঁরা একসঙ্গে প্রতিবাদ করতে পারেন না। সচিব কমিটি কিংবা ছাত্রলীগের আচরণ বিষয়ে বলার কিছু নেই। শুধু আমার মতো সাধারণ শিক্ষকদের কাছে প্রত্যাশা এখনো শিক্ষক সত্তা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর।

● কাবেরী গায়েন : অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।